163

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ OCT 12 1999
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

ছুটির ঘণ্টা না মরণ ঘণ্টা

রবিবারের জনকণ্ঠের প্রথম পাতার একেবারে নিচের দিকে এক কলামের শিরোনামে প্রকাশিত ছোট্ট খবর। অনেক পাঠকের হয়ত নজরেই পড়েনি। শিরোনামটি ছিল 'ছুটির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ভবনটি ধসে পড়ল।' না, ঘণ্টা বাজিয়ে স্কুল ধসিয়ে দেয়ার কোন অনুষ্ঠান বা পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী ছিল না। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে স্কুলের ধসে পড়ার বোধ হয় কোন সম্পর্কও ছিল না। ঘণ্টা বাজামাত্র স্কুলের ধসে পড়ার ব্যাপারটি ছিল নিছক কাকতালীয়। কাকতালীয়ভাবে ছুটির ঘণ্টা বাজল, আর বাউফলের নওয়ামালা সরকারী প্রাইমারী স্কুল ভবনটি ধসে পড়ল। ছুটির ঘণ্টাটি স্কুলের সাড়ে ৪শ' ছাত্রছাত্রীর দুনিয়া থেকে, জীবন থেকে 'ছুটির ঘণ্টা'ও হতে পারত। তা হয়নি, হয়নি অল্পের জন্য। প্রাণচঞ্চল শিশু-কিশোরদের ছুটির ঘণ্টা বাজতেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ার চিরকেলে অভ্যাসের জন্য।

স্কুলটি ছিল ৯৪ বছর বয়সী বৃদ্ধ। ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আমলে ১৯০৫ সালে এর জন্ম হয়েছিল। ৬০ বছর বয়সে, মানে ১৯৬৫ সালে একবার এর কিছু চিকিৎসা, অর্থাৎ মেরামত হয়েছিল। তারপর থেকে মরণতক, অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত জীর্ণতার ভারে আপনাআপনি ধরাশায়ী হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আর কোন চিকিৎসা-পরিচর্যা স্কুলভবনটি পায়নি।

জনকণ্ঠের রিপোর্টে স্কুল কমিটির শাহজাদা মিঞার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, স্কুল ভবনটির পুনর্নিমাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনেক দেনদরবার করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ফলে গত শনিবার ছাত্রছাত্রীরা মাঠে বসে ক্লাস করেছে। অথচ স্কুলটি ছিল সরকারী।

একটি সরকারী স্কুলের এই করুণ পরিণতি, ঝড়-ভূমিকম্প বা অপর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াই যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে এরূপ একটি ভবনে শত ছেলেমেয়ের প্রাণ হাতে নিয়ে বিদ্যা লাভের আশায় প্রতিদিন উপস্থিতি, তাদের নিরাপত্তা ও জীবনরক্ষার ব্যাপারে এমন ঔদাসীন্য অকল্পনীয় বা অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি?

কিন্তু বাংলাদেশে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। দেশের বহুস্থানে জরাজীর্ণ, ঝুঁকিপূর্ণ, পর্যাপ্ত টেবিল-বেঞ্চিহীন, শিক্ষা সরঞ্জামহীন সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা অনেক। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। প্রতিগ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। কিন্তু দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য বলছে যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ অনেক কম। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে যৎসামান্য বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা নব্বই ভাগই ব্যয় হয়ে যায় শিক্ষকদের বেতন বাবদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ বহনে। অবশিষ্ট সামান্য অর্থ দিয়ে চালাতে হয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠক্রমের উন্নয়ন, স্কুল পরিদর্শন, বিনামূল্যে পাঠ্য বই সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম। এর মধ্যে জরাজীর্ণ স্কুলভবনের সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের স্থান কোথায়?

বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা তো আরও শোচনীয়। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বিগত বছরগুলোতে ১.৪২৭ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৮ হাজার ৮৩০টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল নির্মাণের আড়াই-তিন বছরের মধ্যেই জীর্ণদশায় পৌঁছে গেছে। কেন এমন হয় তা জানার চেষ্টা কে করে?

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হলে কি কি করতে হবে তার লম্বা লিস্টি বারে বারে দিয়ে লাভ নেই। আপাতত দু'টি কাজ করা হোক। স্কুলভবনগুলোকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিরাপদ করা হোক যাতে সেগুলো ওদের মাথার ওপর ভেঙ্গে না পড়ে। সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হোক এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হোক।